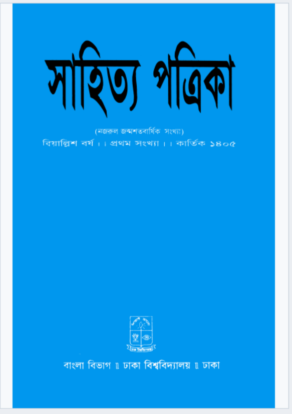

Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের লেটোগান

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.11
Pages	303-347
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের লেটোগান

ওয়াকিল আহমদ*

পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো

ছড়াদার ও দোহাররা সব ভাগলো।- নজরুল

১.

কৈশোরে লেটোগান রচনার মধ্যে দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা রচনার হাতে-খড়ি হয়। লেটোগান চুরুলিয়া তথা বর্ধমান জেলার আঞ্চলিক লোকগীতি। শুধু বর্ধমান কেন, পার্শ্ববর্তী বীরভূম, হুগলি, নদীয়া জেলাতেও এ গানের প্রচলন ছিল। বর্ধমান-বীরভূম জেলায় এ-গান আজও প্রচলিত আছে।

লেটোগান কি? নাট্য থেকে 'লেটো' শব্দের উদ্ভব। নাট্য› নাট ; নাট + উয়া (স্বার্থে) = নাটুয়া › নেটো › লেটো। যে গানে নাট্যের ভাব আছে, তাই লেটোগান। অর্থাৎ এ গান অভিনয়াদি সহযোগে পরিবেশিত হয়। শুধু অভিনয় নয়, এতে নাচ ও বাদ্যের স্থান আছে। অন্য কথায় গান, নাচ অভিনয় ও বাদ্য সমন্বয়ে লেটোগান একটা মিশ্ররীতির সঙ্গীতধারা। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজশাহী জেলায় প্রচলিত 'আলকাপ' একই রীতির লোক-সঙ্গীত। উভয় দলীয় সঙ্গীত, উন্মুক্ত মঞ্চে রাতভর পরিবেশিত হয়। প্রধানত মুসলমান কৃষক সমাজ এসব গানের সমঝদার ও ভোক্তা ; তারাই গানের দল গঠন করে, গান রচনা করে, অবসরকালে মেলাদি অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন করে। গ্রামের কিশোর, তরুণ, যুবকরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। লোকমনোরঞ্জন নিমিত্ত আয়োজিত এসব লৌকিক অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। লেটো ও আলকাপ গানের গঠন-প্রকৃতি ও পরিবেশনরীতি বিশ্লেষণ করলে বাংলার বহুল প্রচলিত যাত্রাগান যে এর উৎস- ভূমি, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

লেটোগান আমাদের আলোচ্য বিষয়, এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা আবশ্যক। দলীয় সংগীত লেটোগানের দলের গঠনটি এরূপ : গান, নাচ, অভিনয় ও বাদ্যের শিল্পীসহ দশ-বারো জনের সমন্বয়ে লেটোগানের দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে 'গোদা কবি' বলে। তিন-চার জন কিশোর ও তরুণ যুবা শাড়ি-গয়না পরে

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নটি সাজে এবং আসরে প্রয়োজন মতো একক ও যৌথ গান গায় ; তাদের নাম 'সখি', 'বাই' ও ছোকরা' ইত্যাদি। গান–অভিনয়ের মাঝে মাঝে হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শক–শ্রোতাকে বিশ্রাম (reflief) দেওয়ার জন্য একজন কৌতুকাভিনেতা থাকে ; তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সঙদার' বলে। পালাগানের মূল অংশে অভিনয় করার জন্য যারা কুশীলব হিসাবে থাকে, তাদের 'পাঠক' বলা হয়। এখানে 'বিবেক' নামে অপর একটি চরিত্র থাকে, সে সংকট মুহূর্তে এসে বিবেকের গান গায়। দলে একজন অল্প বয়সের সুশ্রী বালক থাকে, সে প্রয়োজন মতো কিশোর বা কিশোরী সেজে ব্যঙ্গ–বিদ্রূপাত্মক মজাদার সংলাপ বলে অভিনয় করে ; তার নাম 'ব্যাঙাচি'।৮ দলের অন্যান্য সদস্য হল–গানের জন্য 'মাস্টার', সাজ–সজ্জার জন্য 'পেন্টার', ব্যবস্থাপনার জন্য 'ম্যানেজার' ও নিরাপত্তার জন্য 'আগলদার'। গান ও পালা রচনার জন্য মাস্টার বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। বাদ্য হিসাবে হারমনিয়ম, তবলা, ডুগি, জুড়ি, ছোট–বড় ঝাঁঝ, বাঁশি, ঢোল, বেহালা, সারিন্দা, করতাল, খঞ্জনি ইত্যাদি। এসব যন্ত্র বাজাবার জন্য দলে তবলচি, বংশীবাদক, জুড়িদার, ঢোল–হারমনিয়ম–বেহালা–সারিন্দা বাদক থাকে। কোন কোন বাদ্যশিল্পী একাধিক যন্ত্র–সংগতে অংশ নিয়ে থকে। দলের এসব সদস্যের মধ্যে পেশাদার– অপেশাদার উভয় ধরনের শিল্পী থাকে। যারা গাইয়ে নাচিয়ে হিসাবে নাম করে তাদের বেশ কদর হয়। বেশির ভাগ শিল্পী অপেশাদার ; চাষের মৌসুমে ক্ষেত–খামারে কাজ করে ; ফসল উঠে গেলে হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন দল গঠন করে মেলাদি উপলক্ষে গানের আসর বসায়। মেলা ছাড়াও লেটোগানের আসর বসতে পারে।

মাঠ–ঘাট–বাগান–পুকুরপাড় ইত্যাদি খোলা জায়গায় শামিয়ানা খাটিয়ে এই গান হয়। মাঝখানে মঞ্চ, একটু দূরে সাজঘর, মঞ্চ ও সাজঘরে যাতায়াতের জন্য সরু পথ ছাড়া চারদিক ঘিরে দর্শক–শ্রোতা আসন গ্রহণ করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেটোগান পরিবেশনের একটি পর্যায়ক্রম (sequence) আছে। সাধারণত একটু বেশি রাতেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে বাদকের দল বিভিন্ন তালে বাদ্য বাজিয়ে আসর জমায়। চারজন 'সখি' দর্শকদের সালাম জানায় এবং নেচে নেচে বন্দনা গায়। সখিরা সাজঘরে ফিরে গেলে নটি বেশে 'বাই' এসে কয়েকটি একক গান গায়, সে গানের সাথে নৃত্য করে। মঞ্চস্থ বাজনদার নাচে–গানে তাল ও সুর সঙ্গত করে। এরপর নারী–পুরুষ বেশে দ্বৈত গানের শিল্পী এসে হাস্কারসের গান গায় ; গানের বাণী হয় উত্তর–প্রত্যুত্তরমূলক। এর পরের শিল্পী একজন পুরুষ ; সে বেশ অভিজ্ঞ গায়ক – একক কণ্ঠে হাস্কারসের বিনোদনমূলক গান পরিবেশন করে । নাচ–গানের পর শুরু হয় নাট্যাভিনয়। গদ্য ও পদ্য উভয় আকারে সংলাপ রচিত হয়। লঘুভাব ও হাস্যরসের

এসব অভিনয় দেখে দর্শকরা প্রচুর আনন্দোপভোগ করে থাকে। পালাগুলো পূর্বেই লিখিত হয়, পাত্র-পাত্রী সংলাপ মুখস্থ করে ও অভিনয়ে তালিম নেয়। দৈনন্দিন সংসারজীবন, দাম্পত্যজীবন থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক নানা কাহিনি নিয়ে ছোট-বড় পালা লেখা হয়। এসবের কতক নাম এরূপ : স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, জেলে ও জেলেনি, আজব বিয়ে, অপূর্ব বিচার, রাধা বিনোদ, রাজা হরিশচন্দ্র, জয়চাঁদের ধর্ম-পরীক্ষা, দস্যু রাহরাম, বীর হাম্বীর, মাটির কেল্লা, শয়তানের চর ইত্যাদি।[১] এসব কাহিনির দৈর্ঘ্য অনুসারে অনুষ্ঠানের সময় নির্ভর করে। বড় কাহিনি হলে শেষ রাত পর্যন্ত আসর চলে। নাট্যাভিনয়ের মাঝে সঙদার, ব্যাঙাচি, বাই এসে নাচ-গান-কৌতুক করে দর্শক-শ্রোতাকে বাড়তি আনন্দ জোগায়।

লেটোগানের পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালক পূর্বেই ছক বেঁধে ও কুশীলবদের তালিম দিয়ে সাজিয়ে নেয়। একে বাঁধা লেটো বলে। আর এক ধরনের লেটো আছে যাতে কবির লড়াইয়ের মতো দুই লেটোদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। এর বিষয়বস্তু পূর্বনির্ধারিত হতে পারে, আবার উপস্থিত মতো হতে পারে। এতেও নাচ-গান-সংলাপ সবই আছে, তবে কতক অংশে প্রশ্নোত্তর থাকে। প্রশ্নোত্তর পর্বে দলের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। বিজয়ী দলের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। সুশীলকুমার গুপ্ত বলেন,

> পশ্চিমবঙ্গে 'লেটোনাচ' নামে যে এক প্রকারের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে তাকে যাত্রাগান ও কবির লড়াই-এর একটা মিশ্রিত সংস্করণ বলা চলে। এতে গ্রাম্য কবির রচিত কাব্যে অভিনেতারা অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়। এই ব্যবস্থায় দুই দলের মধ্যে যে পক্ষ জয়ী হয় তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়।[২]

লেটোর প্রশ্নোত্তর পর্ব কবিগানের প্রভাবজাত ; বৈচিত্র্যসাধন ও আনন্দবিধানের জন্য এ পর্ব মূল ধারার সাথে যুক্ত হয়েছে। আগের তুলনায় চর্চা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও লেটোগান বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলে আজও টিকে আছে।

২

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে লেটোগান রচনা করেন। লেটোগানের সাথে তাঁর নিকট ও নিবিড় সম্পর্ক আছে, বলা যায়, এ সম্পর্ক নাড়ির।

---

১ মুহাম্মদ আয়ুব হোসেন, 'গ্রামীণ নাটক : লেটোগান ' *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০২, পৃ. ২৮৫-৩০০

২ সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস,* কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৫

লেটোগানের রূপ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোকপাত করেছি, এবার নজরুলের সাথে লেটোগানের সম্পর্ক ও তাঁর ওপর প্রভাবের কথা বলা যাক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লেটোদলের সাথে নজরুলের যোগসূত্র ছিল ক্ষণকালের এবং লেটোগান রচনার বিষয়টি ছিল নজরুল-রচনাসমগ্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। উপরন্তু লেটো হল লোকনাট্যের বা লোকসঙ্গীতের বিষয়ভুক্ত একটি ধারা। নজরুল ইসলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের একজন অতি উঁচু মাপের স্রষ্টা। নজরুলের ঘটনাবহুল জীবন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার সাথে লেটোগানের আলোচনা কালে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম লেটোদলের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজে লেটোগান রচনা করেন। তিনি বালক নজরুলের কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁকে লেটোগান লিখতে উৎসাহিত করেন। নজরুলের বাল্যজীবনের ওপর আলোকাত করে আনওয়ারুল ইসলাম লিখেন,

> বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না, তাই নজরুলও এই সব 'লেটো'র দলে গান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। তাঁর বয়স তখন ১২/১৩ বৎসর মাত্র অথচ এ সময়ের রচনা তাঁর এত ভালো হতে লাগল যে তিনি ক্রমে নিমাশা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটিই 'লেটোনাচে'র দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদবধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন।[৩]

আনওয়ারুল ইসলাম এ-তথ্য দিচ্ছেন ১৯৪৪ সালে ; তিনি লেটোগানকে 'লেটোনাচ' বলেছেন, আর যাকে 'নাটক' বলেছেন তা হলো পালাগান জাতীয় লোকনাট্য। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার গুপ্তের একটি উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেন,

> সেই সময় 'লেটোনাচের' দলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে যিনি বিবেচিত হতেন, তাঁকে 'গোদা কবি' আখ্যা দেওয়া হত। নজরুলের কাব্য প্রতিভার প্রতিশ্রুতি দেখে সেই সময়কার 'গোদা কবি' নজরুলের বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি নজরুলকে ডাকতেন 'ব্যাঙাচি' বলে। একটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি নজরুলের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে।'[৪]

ঐ সময়ে এ অঞ্চলের লেটোগানের 'গোদা কবি' ছিলেন শেখ চকোর। রফিকুল

---

৩ আনওয়ারুল ইসলাম, 'নজরুলের বাল্যজীবন', *কবিতা,* কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ কলকাতা, পৃ. ৩৪-৩৫

৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

ইসলাম বলেন যে, শেখ চকোর ও কবিয়াল বাসুদেবের দলের লেটো ও কবিগানের আসরে নজরুল বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেন। নজরুল একাধারে গান, কবিতা, পালা রচনা করেছেন, আবার আসরে কোন কোন বিষয়ে অংশগ্রহণও করেছেন।[৫]

১৯০৮ সালে নজরুল ইসলামের পিতা কাজী ফকির আহমদ মারা যান। নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুন ৩ ছেলে ও ১ কন্যা নিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েন। অর্থের জন্য নজরুলকে হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম ও মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করতে হয়। খুব সম্ভব, এই কারণে নজরুল লেটোদলের জন্য গান, কবিতা, পালা লিখেন। ১৯১০ সালে নজরুল ইসলাম রানিগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুলে ভর্তি হয়ে ছাত্রজীবনে ফিরে যান। সুতরাং ১৯০৮–১০ সালের মধ্যবর্তী কোন এটা সংক্ষিপ্ত সময়ে ছিল নজরুলের 'লেটোজীবন'।

কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায়। নজরুলের নামে প্রচলিত যেসব লেটোগান ও নাটিকা আমাদের হাতে এছে, সেগুলার ভাব-ভাষা-প্রকাশরীতি বিচার করলে খুব কাঁচা হাতের রচনা বলে মনে হয় না। কোন কোন রচনায় কিছুটা অগ্রসর মন ও প্রকাশরীতির পরিচয় আছে। এতে ধারণা হয়, স্কুলে লেখাপড়া করলেও লেটোদলের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। আয়ুব হোসেন এ-ব্যাপারে আলোকপাত করে লিখেন :

> তিনি যখন শিয়ারসোল বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন গোপনে লেটো লিখে দিতেন গান প্রার্থীদের এবং গোপনে রানীগঞ্জের এক নির্জনে আমবাগানে চলতো গান শিক্ষার মহড়া। তাঁর এইসব গান, ছক, পালা লেটোশিল্পীদের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এক বৃহৎ পরিমণ্ডলে।[৬]

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের উক্তি :

> মাথরুন স্কুল ত্যাগের পর নজরুলের ভবঘুরে জীবন আবার শুরু হয়। সম্ভবতঃ এ সময় তিনি বাসুদেবের কবিদলের জন্য গান, পালা ইত্যাদি লিখে সুর দিয়ে দিতেন, কখনও কখনও ঢোলক বাজিয়ে আসরে গানও করতেন ... কবি বাসুদেবের মহড়ায় নজরুলের গান শুনে বর্ধমান আণ্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন গার্ড মুগ্ধ হন এবং নজরুলকে একটা অদ্ভূত ধরণের চাকরী দেন।[৭]

---

৫ রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম', *নজরুল অ্যালবাম*, ঢকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১

৬ মুহাম্মদ আয়ুব হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১–৮২

৭ রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, ঢাকা ১৯৭২, পৃ. ১৭

নজরুলের এই চাকরি ছিল গার্ড সাহেবের বাড়ি থেকে রেল-ষ্টেশনে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার আনার। এ-সময় ছিল ১৯১১ সাল। ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রায় এক বছর কাটিয়ে গ্রামে ফিরে কোন কোন লেটোদলের অনুরোধে তিনি গান রচনা করে দেন। এ সময় ছিল ১৯১৪ সাল।

শেখ আজিজুল হকের বক্তব্য :

> নজরুল ইসলামের অকস্মাৎ যুদ্ধগমনে লেটোর আকাশে দেখা দেয় অমানিশার অন্ধকার। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ওস্তাদের অভাবে ঘরে ঘরে ওঠে রোদনধ্বনি। কেউ কেউ গাইতে থাকেন মনের খেদে, দুঃখে –
>
> আমরা অধীন হয়েছি ওস্তাদহীন
> তাই নিশিদিন ভাবি বিষাদ মনে।
> নামেতে নজরুল ইসলাম
> কি দিব গুণের প্রমাণ
> না পাই সন্ধান কোনখানে।[৮]

নিমশার লেটোদল তাঁকে 'ওস্তাদ' বলে গণ্য করে। ১৯১৭ সালে নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোদগান করে বিদেশে পাড়ি দেন ; ১৯১৯ সালে বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফিরে এসে কলকাতায় অবস্থান করেন, গ্রামের জীবনে আর ফিরে যাননি। এরূপ অবস্থার কথা স্মরণে রেখে নিমশার লেটোদল এ গান রচনা করে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের ধারণা হয়, নজরুলের লেটোজীবনের পরিধি ১৯০৮-১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩.

নজরুল ইসলাম লেটো-সংক্রান্ত কি কি রচনা করেন? সুশীলকুমার গুপ্ত 'শকুনি বধ', 'চাষার সঙ', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা'— এই চারটি পালাগানের নাম করেন এবং নমুনা স্বরূপ প্রতি পালা থেকে চারটি গানের উদ্ধৃতি দেন।[৯] পূর্বে উদ্ধৃত আনওয়ারুল ইসলামের উক্তি থেকে 'মেঘনাদবধ' নামে একটি নাটিকার কথা জানা

---

৮ শেখ আজিবুল হক, 'নজরুল সাহিত্যের এক অনালোচিত অধ্যায়', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, নবম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ৪৫

৯ *নজরুল-চরিতমানস*, পৃ. ৩৬-৩৭

যায়। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম 'দাতাকর্ণ' ও 'কবি কালিদাস' নামে দুটি অতিরিক্ত নাটিকার উল্লেখ করেন। শেখ আজিজুল হক 'কবির লড়াই' শীর্ষক অপর একটি নাটিকার নাম করেন। এতে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কবিয়াল গুমানী দেওয়ানের নাম আছে।[১০] মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে নজরুল রচিত 'রাধাবিনোদ' নাটিকার সন্ধান দেন। তিনি অপর একটি প্রবন্ধে বলেন, "'... বৌ-এর বিয়ে', 'আজব বিয়ে' এবং 'জেলে-জেলেনী' ছকগুলি কবি নজরুল ইসলামের বয়ঃ-সন্ধিকালের রচনা বলে প্রবীণ লেটো-শিল্পীরা জানিয়েছেন।"[১১] তিনি ঐ প্রবন্ধে জেলে-জেলেনী ছক বা নাটিকাটি সংকলিত করেছেন।

সুশীলকুমার গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত প্রথম গানটি 'সাঁকো' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬২, দ্বিতীয় ও চতুর্থ গান দুটি 'আজাদ' পত্রিকার ১১ ও ১২ জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৪ সনে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটিতে ভনিতা আছে, পরের দুটিতে নেই। প্রথম গানে রূপকের আধারে ব্যঙ্গ আছে, দ্বিতীয় গানে ইসলামের তত্ত্বকথা, তৃতীয় গানে বন্দনা, চতুর্থ গানে স্বদেশপ্রেম আছে। পল্লীগীতির আঙ্গিকে ও সুরে গানগুলো বাঁধা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবে, শব্দচয়নে ও প্রকাশরীতিতে যে সুপ্ত প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ দীপ্তিমান, তা লক্ষ্য করা যায়।

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন 'গ্রামীণ নাটক : লেটোগান' প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের রচিত কয়েকটি গান ও একটি পালাগান সংকলিত করেছেন। তিনি ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, "গানগুলো .... কাজী নজরুল ইসলামের বয়ঃসন্ধিকালের রচনা—এমন কথা লেটো-শিল্পীরা আমাকে জানিয়েছেন।"[১২] আমরা দুটো গান (৭ ও ৮নং) সংকলনে গ্রহণ করেছি। এগুলো নজরুলের রচনা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অন্যের রচনা নজরুলের নামে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গানগুলোর ভাব-ভাষা উচ্চ, পদবন্ধে মুন্সিয়ানা আছে।

'জেলে ও জেলেনী' নামে পালাগানটি দীর্ঘ, পালাটিতে জেলে-জেলেনির সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবনের কথা আছে। আকালের বছর জেলে মাছ ধরতে সাগরে গেছে, মাছ বেচে অর্থ আনবে, দুঃখ ঘুচবে—এই তাদের আশা। জেলেনি ঘরে একা, স্বামীর বিচ্ছেদে কাতর সে। প্রথাগত পদ্ধতিতে বারমাসী গেয়ে বিরহ-বেদনা প্রকাশ করে। বারমাসী দিয়ে পালা শেষ হয়েছে। এর শেষ গানটি এরূপ :

---

১০ শেখ আজিমুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

১১ মুহাম্মদ আয়ুব হোসেম *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৩

১২ ঐ, পৃ. ২৮২ (পাদটীকা)।

ও আমার জেলো রে, সোনার জেলো রে,
দিন গেল মাস গেল, বছর ঘুরে এলো রে।
তোর যৈবুন লয়ে আমি দুয়োরে বসি কাঁদিরে।।
ও তু বাড়ি ফিরে আয় রে,
দুখের সাগরে ভাসি রে,
হাত ধরে কেবা তোলে রে।
ও আমার সোনার জেলো, তু বাড়ি ফিরে আয় রে।
দুখু মিয়া এ আসরে জেলেনীর দুখ গায় রে।।[১৩]

এই 'দুখু মিয়া' নজরুল ইসলামের কিশোর বয়সের ডাক নাম, তাঁর অপর ডাক-নাম 'নুরু'। আয়ুব হোসেন শ্রীমতী অঞ্জলি মাঝির মুখ থেকে পালাটি সংগ্রহ করেন। অঞ্জলি মাঝি মণ্ডলকোটের লেটোগানের আসরে এই গান শুনে মুখস্থ করে।[১৪] খুব স্বাভাবিক, শুনে মুখস্থ করা গান পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে বাধ্য। বস্তুত আয়ুব হোসেন কর্তৃক সংগৃহীত গানগুলো যে নজরুল ইসলামের রচনা তা ভাব ও ভাষারীতি বিচার করে বলা যায় না। লেটো-শিল্পীর মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়েছে-এ তত্ত্ব মেনে নিলে বলার কিছু থাকে না। তবে দলের জনপ্রিয়তা বাড়াবার স্বার্থে পল্লীকবির রচিত লেটোগান নজরুলের নামে চালাবার প্রবণতাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের মতে, ওজন করলে পরের পাল্লাই ভারি হবে।

সুশীলকুমার গুপ্ত যাকে 'রাজপুত্রে'র পালা বলেছেন, শেখ আজিজুল হক একটি প্রবন্ধে তাকে 'রাজপুত্রের সঙ' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই পালার পূর্ণ রূপটিও উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। তিনি 'আকবর বাদশার সঙ'ও সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও কয়েকটি বন্দনা ও চাপান গানও পরিবেশন করেছেন। আমরা উভয় পালা সংকলিত করেছি।

এখানে 'সঙ' শব্দটির একটু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। 'সঙ' দেশজ শব্দ, অর্থ - 'অদ্ভুত পোশাকধারী কৌতুককারী অভিনেতা'। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Joker। যাত্রাগান ও অনুরূপ লোকনাট্য, সার্কাস ও মেলাদি অনুষ্ঠানে এরূপ অভিনেতা সঙ

---

১৩ ঐ, পৃ. ৩০০

১৪ ঐ পৃ. ৩০৪-০৫ (পাদটীকা)

সেজে কৌতুকাভিনয় করে দর্শক-শ্রোতাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন বর্ণের পোশাক পরে, মুখমণ্ডল চিত্রিত করে, প্রয়োজন অনুসারে পায়ে ঘুঙুর পরে। 'লোকনাট্যে হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, কৌতুক, কখনো কখনো আদিরসের ছোট ছোট পালা রচিত ও অভিনীত হয়—লেটোগানের এ ধরনের পালার সাথে 'সঙ' শব্দ যুক্ত হয়েছে। দেখা যায়, লেটোগানের সমতুল বোলান, আলকাপ, গম্ভীরা গানেও সঙ জাতীয় পালা আছে, যা সমকালের সাংসারিক জীবন, সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করে রচিত হয়। এগুলোতে নীতি- উপদেশও শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লোককবি বলেন :

মোদের এ সঙ নয় শুধু কালি মেখে সঙ সাজা,
নয় কো শুধু হাল্কা হাসি, নয়কো শুধু মজা।
সংসারেতে সাজার ওপর সাজেন যিনি যে যা
তারি ছবি দেখাই সবে সহজ ভাষায় সোজা।
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি আদি,
বলতে গিয়ে কারো প্রাণে ব্যথা দি যদি
ক্ষমা করবেন, সবার কাছে এই মোদের মিনতি,
সত্যের ভাষণ, সত্যের গানই মোদের সঙের নীতি। [১৫] -হাওড়া

সমাজের ও মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয় সঙ জাতীয় লোকনাট্যের মাধ্যমে, গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে এগুলো রচিত হয়। পালা বুঝাতে সঙের পাশাপাশি 'ছক' ও 'ডাকসুরা' শব্দ দুটিও প্রচলিত আছে।

নজরুল রচিত 'রাজপুত্রের সঙ' লোককাহিনি ভিত্তিক - রাজপুত্রের ও মন্ত্রীপুত্রের সংক্ষিপ্ত সংলাপে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আছে ; ঘটনাটি রহস্যাবৃত। রূপকাশ্রয়ে রচিত পালাটি অর্থবাহী ও জ্ঞানগর্ভী। 'আকবর বাদশার সঙে' ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াসম্পাৎ আছে ; এতে আকবর সেনাপতি হোসেন কর্তৃক বাংলার পাঠান সুলতান দাউদ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিধন করার কাহিনি আছে। এতে রঙ তামাসা নেই, বরং ট্রাজেডি আছে। 'জেলে-জেলেনী' 'ছকে' গ্রামীণ দাম্পত্য জীবনের ছবি আছে, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

---

১৫ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', *মনীষা*, ১৯৯৬, পৃ. ৬৮

৪.

এখন কথা হল, নজরুল মানস ও রচনায় লেটোগানের প্রভাব কি ও কতখানি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন,

> নজরুলের কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ জীবনের শুরু লেটোদল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ সম্ভবতঃ লেটোদলের জন্য পালা রচনা করতে গিয়েই হয়েছিল। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক কবিতা ও গান রচনা করার কৌশলও তিনি কিশোর বয়সে লেটোর আসরেই রপ্ত করেছিলেন। সুতরাং নজরুলের লেটোজীবনকে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতজ্ঞ জীবনের শিক্ষানবিশীর কাল বলা যেতে পারে।[১৬]

ঐ সময় লেটোগান রচনা করার মাধ্যমে তাঁর ভেতর কবিতা ও গান রচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিকে জানার, উদারভাবে গ্রহণ করার ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করার পটভূমি রচিত হয়েছিল। আমরা দেখেছি, এসব ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের সাফল্য আজও তুলনারহিত।

নজরুলের লেটোগানে সাধারণ জনগণের রুচির ও সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। বাংলার জন ও জনতার কথা নজরুল ইসলামের সমস্ত সাহিত্যকর্মের মর্মস্থলে বিরাজমান। বায়বীয় চেতনা, কিংবা কল্পনাবিলাস তাঁর সাহিত্যে স্থান পায়নি, কেননা তিনি জনতার দীন-হীন-মূঢ়-ম্লান মুখ দেখেছেন। কতক লেটোগান আসরে তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করতে হয়। জনতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে গান ও কবিতা রচনার দক্ষতা নজরুল ইসলাম এভাবেই আয়ত্ত করেন। বুদ্ধদেব বসু বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা অতিমানবীয় ক্ষমতা - নজরুল ইসলামের সে-ক্ষমতা ছিল। অনুরোধ মাত্র অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি - লেটোগান দিয়ে নজরুলকে মাপা যাবে না। নজরুল ইসলাম আধুনিক কবি, গীতিকার, সাহিত্যিক। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ কয়জন আছে? 'গোদা কবি'র মন্তব্যটাই ঠিক—"আমার ব্যাঙাচি বড় হয় সাপ হবে।" ব্যাঙাচি বড় হয়ে ব্যাঙ হয়নি, 'সাপ'ই হয়েছে ; বড় জাতের সাপ - একেবারে 'গোখরা'। নজরুল রচনাসম্ভারে লেটোগানের অবস্থান যাই হোক, নজরুল-

---

১৬ সেখ আজিবুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

পরিক্রমায় তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নজরুল ইসলামের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি – উক্তিটি করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে :

বীরভূম-বর্ধমানের পাড়াগাঁয়ে কবিগানেরই রকমফের লেটু। তাদের কাছে ঘেষেছিলাম, ছেলেবেলায় গান গাওয়ার সখে। কিন্তু গাওয়ার চেয়ে গান লেখাই হল আমার সেখানে বড় কাজ। আজ সেই লেটুগান লিখিয়ের কবিতাই কবিগুরু পড়ছেন। এর নাম বরাত।[১৭]

লেটো ও কবিয়াল নজরুল ইসলামকে বুঝবার জন্য আমরা তাঁর রচিত লেটোগান ও পালাগান বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে একত্রে সংকলিত করলাম। নজরুলের প্রতিভা বিকাশের প্রাক্‌–স্তরটি কিরূপ ছিল –এসব গানে তার পরিচয় আছে। "যে ছাও উড়ে সে বাসায় ফরকায়।"– প্রবাদের অনুসরণে বলা যায়, নজরুলের লেটো ও পালাগানে স্ফুটনোন্মুখ কবি–প্রতিভার সেই কলকাকলি ও পক্ষধ্বনি শোনা গেছে। প্রতিটি গান–সংগ্রহের উৎস পাদটীকায় দেওয়া হল।

---

১৭ *নজরুল অ্যালবাম*, পৃ. ১১

লেটোগান : সংগ্রহ

(১)

আসর বন্দি আগে নামে তে তোমার।
তোমার শত পাক নামেতে রাখি চারিধার।।
আখেরি রসুলের তরে
পোস্তুদান এই আসরে
দাও গো আমারে দুশমনের দাগার পরে হই না গেরেপ্তার।।
মশরেকে আবু বক্করে
মগ্‌রবে হজরত উম্মরে
রাখি গো দ্বারে জেবরাএলে উত্তরে নেঘাবান আমার।
সেরে খোদা দক্ষিণেতে
হাসেন হোসেন ওধোগতে
উর্দ্ধ দিগেতে মেহেরবান হও, আসরেতে দুশমন হোক জেরবার।।
মা বাপ ওস্তাদের কদমে
আদাব করলে শত হরদমে
সাল্লাম খাস আদমে, কয় অধীন **নজরুল এসলা**মে, দাও গো আজি কেনার।।

—আসর বন্দনা

(২)

নেগাবান হও রহমান আজি আমার আসরে।
লতিফোল খবির তুমি, তোমা বই কে উদ্ধারে।।
ইব্রাহিম খলিল বাসাকায়

---

১. শেখ আজিবুল হক—'নজরুল সাহিত্যের এক অনালোচিত অধ্যায়', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০০, পৃ. ৪৯

২ ঐ, পৃ. ৪৯

নমরূদের আতসে তাহায়
বাঁচাইলেন নিজ দয়ায় জবিহুল্লার তরে।।
তুফানে নুহু নবিউল্লাহ
তুরাইলেন বারিতালা
নীল দরিয়ায় করিমুল্লাহ, বাঁচাও রহমতের জোরে।।

এড়াতে এহুদিদের হাতে
হজরত ঈশা আসমানেতে
রাখলেন যেন নিজ দয়িতে, তেমনি রক্ষ মোরে।।
তুমি মহায়মেস সাল্লাম
কয় কাতরে **নজরুল এসলাম**
বায় সাগরে ডুবিলাম, তরাও সবহান কাদেরে।।
– আসর বন্দনা

(৩)

এত করে বুঝাইলাম তবু বুঝলি না কেনে
এত উপহাসে তোর কি লজ্জা হল না মনে?
ঠিক বটে মূর্খের কাছে
শাস্ত্রালাপে কি লাভ আছে
দর্পণ দিলে অন্ধের কাছে, সে কি তার মর্মজানে?
ভেলা দ্বারা অগাধ সাগর
পার হইবার বাসনা তোর

---

৩. শেখ আজিবুল হক—'*লেটোগানে নজরুল*', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৯৫, পৃ. ২২
এখানে নজরুলের ভূমিকা কবিয়ালের ; প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে এরূপ আক্রমণাত্মক গান গাওয়া হয়। পুরো গানটি একটি সংলাপ ; এতে বুদ্ধির ও যুক্তির দীপ্তি আছে।

বামনে হাতে শশধর ধরেছে রে কোনখানে?
ছি ছি রে মরি লজ্জাতে
খোঁড়া যায় পর্বত লঙ্ঘিতে
ঘুঁটে কুড়েনির বেটাতে রেশমের পোশাক কিনে?
নির্বুদ্ধি অসভ্য তাঁতী
চিনেছিল যেমন হাতী
সেই রূপ রে তোর বুদ্ধির জ্যোতি, **নজরুল এসলাম** ভনে।।
–কবির লড়াই

(৪)

কেমন ওস্তাদ হে তুমি
দেখবো আজি সভাস্থলে
ভীত হবে তোর ঐ দম্ভে
যে হবে কচি ছেলে।।
ক্ষুধার্ত সিংহ এসেছে,
মৃগদের কি রক্ষা আছে?
সাধের সামগ্রী পেয়েছে
আজ কৌতূহলে।।
সকালে মেঘের মত
গর্জনে আর করবি কত!
পালা মস্তক করে নত।

৪. শেখ আজিবুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২
কবির লড়াইয়ের আঞ্চলিক নাম *ঠেস* গান। '*ঠেস*' দেশজ শব্দ, অর্থ খোঁটা, কটাক্ষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন এবং নিজকে শক্তিশালী ভেবে আক্রমণাত্মক যে গান রচিত হয়, তাকে *ঠেস* গান বলা হয়। পালার যে অংশে দু' পক্ষের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ বা বাক্‌যুদ্ধ হয়, সে অংশে আস্ফালনযুক্ত এরূপ গান গাওয়া হয়।

নজরুল এসলাম বলে।।

—কবির লড়াই (ঠেস গান)

(৫)

পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো।
ছড়াদার আর দোঁহাররা সব ভাগলো।।
(ওদের) ছন্দ সুরের মিল নাই তো গানেতে।
ও মিঞার জ্ঞান নাই কো তানেতে
ওদের মাটির সাথে আকড়া মিশাল ধানেতে।
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা থানেতে।।
দেখে ইহা ভদ্রলোকে রাগলো !
(ওদের) ছড়াদাররা সব ভাগলো।।

–কবির লড়াই (চাপান গান)

(৬)

ওহে ছড়াদার, ওহে That পাল্লাদার
মস্ত বড় Mad

---

৫. ঐ, পৃ. ৪১ ; বিশ্বনাথ দে—'কবির বাল্য রচনা', *শতকথায় নজরুল* (কল্যাণী কাজী সম্পাদিত), কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৪৮ ; 'লেটোগানে নজরুল', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০
ছড়াদার, পাল্লাদার, দোহার প্রভৃতি লেটোগানে অংশগ্রহণকারী কুশীলব।

৬. বিশ্বনাথ দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
গানটিতে ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। নজরুল স্কুলের ছাত্রাবস্থায় গানটি রচনা করেন। that–ঐ, mad –পাগল, monkey like–বানরের মত, very cad– খুব ইতর ব্যক্তি, Lion Lad – সিংহ শাবক, Brother– ভ্রাতা, Sad – দুঃখ, করুণ, ইয়ে বড়া তাজ্জব বাত – এ বড় আশ্চর্য –কথা ; হামভি – আমারও; মচ্ছড়–মাছি ; বাবর কী সাথ – সিংহের সাথে। এ ধরনের মিশ্র ভাষা সাধারণ দর্শক–শ্রোতা খুব কৌতুকভরে উপভোগ করতো। এখানেও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হয়েছে।

চেহারাটা Monkey Like
দেখতে very cad।।
Monkey লড়বে বাবর কী সাথ,
ঈয়ে বড়া তাজ্জব বাত।
জানে না ও ছোট হলেও
হামভি Lion Lad।।
শুনো ওহে Brother দোহারগণ
'মচ্ছ ছানারা সব করিয়াছে পণ
গান গাইবে আসর মাঝে
খবর বড় Sad।।
—কবির লড়াই (চাপান গান)

(৭)

আমি করবো না আর বিয়ে।। ধুয়া
আমার বিয়ের শখ মিটেছে
দাদার বিয়ে দিয়ে।।
এলাকার যত নারী
মুখ লয় সব তৈল হাঁড়ি
(আবার) আলতা সিঁদুর পরছে তারা
বাক্‌সো বাঁধা দিয়ে।।
দাদারা সব সইতে পারে
একটা ছাড়া দশটা করে

---

৭. মুহাম্মদ আয়ুব হোসেন -'গ্রামীণ নাটক : লেটোগান', *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০২ , পৃ. ২৮৪-৮৫
কমিক গান ঠাট্টা-তামাশার গান, এসব গানে শ্রোতা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে।

আমি বাবা রোগা ছাগল
পালায় বাগান দিয়ে।
বিয়ে করে কত মজা
জানে সেই দাদা শালা
কেমন বকশিস পাচ্ছে দাদা
ঝাঁটা পিটা দিয়ে।।

—কমিক গান

(৮)

বিড়াল বলে মাছ খাব না,
আঁশ ছোব না, কাশী যাবো।। ধুয়া
তাই দেখে এক বুড়ো বাঁদর,
গলাতে সে জড়িয়ে চাদর
বাঁদর বেটা বলছে হেসে—
[দর্শকদের দিকে চেয়ে —'কি বলছে?']
(বলছে) আমি পৈতে নেবো, বামুন হবো।।
তাই শুনে এক ধেড়ে ইঁদুর,
কপালে সে দিয়ে সিঁদুর,
ইঁদুর বিটি বলছে হেসে -
[দর্শকদের দিকে চেয়ে —'কি বলছে?']
(বলছে) আমি বামুণ্ডী ক্লাবের বৌ হবো।।

—কমিক গান

---

৮. ঐ, পৃ. ২৮৫

(৯)

বুঝিলাম নাথ এতদিনে
যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয়
আমারে বল না হে।।
তোমার হিয়া কঠিন অতি,
জান না শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রণয় বাতি
আর বাতি জ্বেল না হে।।
এইরূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণমণি
কপাল-দোষে বিরহিনী
তোমার আর হল না হে।।
বিরহ-জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়ো না বাঁকা শ্যাম,
ভেবে বলে **নজরুল ইসলাম**
মের না ললনা হে।। – প্রেমের গান

---

৯. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাসম্ভার*, কলকাতা, ১৩৩৮, পৃ.৫৫
সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' (ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৩) থেকে গানটি তিনি সংকলন করেন। তিনি বলেন, "পল্লীর লেটোদলের জন্য কবির কিশোর বয়সে রচিত পালাগানের একটি গীত।" ঐ পৃ. ৫৫
কোন পালাগানের অন্তর্ভুক্ত তা জানা যায়নি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পালা হতে পারে তা। আমাদের সংকলনে গৃহীত গান-গীত-পালার মধ্যে এটি মুদ্রিত আকারে প্রাপ্ত প্রথম গান। গানটিতে কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধার অন্তরের ব্যথা-ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। এটি রাধার উক্তি। লেটোগানের আঙ্গিকে তা রচিত হয়েছে। ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ সমন্বিত একটি আদর্শ লেটোগান এটি। অন্য লেটোগানের মতো এতেও ভনিতা আছে। বিশ্বনাথ দের রচনাতেও গানটি সংকলিত হয়েছে ; এতে অতি সামান্য পাঠভেদ আছে। *শতকথায় নজরুল*, পৃ. ৫০

(১০)

রব না কৈলাসপুরে –
আই অ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফ্যাসন
আহা মরি, কি লাইটনিং।।
ইংলিশ ফ্যাসন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কাম-অন ডিয়ার গুডমর্নিং।।
বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হেণ্ডশেক করে,
বসায় তাকে রেস্পেক্ট করে
হোল্ডিং আউট এ সিটিং।।
তারপর বন্ধু মিলে
ডিঙ্কিং হয় কৌতূহলে,
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং।।

---

১০. ঐ, পৃ. ৫০–৫১
কমিক হল হাসি-তামাসা জাতীয় হাল্কা রসের গান। খুব সম্ভব, পালাগানেরও ফাঁকে 'সঙদার' অথবা 'ব্যাঙাচি'র মুখে এ-ধরনের গান দিয়ে দর্শক-শ্রোতাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। সাধারণ দর্শক চটকদার শব্দের খেলায় বেশ আনন্দ উপভোগ করে। গানের ছন্দ, পঙ্‌ক্তি বিন্যাস ও ভনিতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—এটি লেটোগানের সাথে অভিন্ন।

(১১)

মেরা দিল্ বেতাব কিয়া
তেরী আব্রু–য়ে কামান ;
জ্বলা খাতা হ্যেয়
ইশ্‌ক–মে জান পেরেশান।
* * *
হেরে তোমায় ধনি,
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কি যে বদনের শোভা,
মাতোয়ারা প্রাণ
বুলবুল করতে এসেছে
তাই মধু পান।।

(১২)

মাহেরম দারসে মাহতাব
সা জেগাং কারি।
বারকার্ফে পয়েদা উঠা
পিলাদে দিদাং বাড়ি।।
* * *
দাগ যেমন আছে চাঁদে
তেমনি দাগ আমার হৃদে।
দেখাইয়ে বদন চাঁদে
বাঁচা প্রাণ সুন্দরী।।

---

১১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাসম্ভার*, ঢাকা, ১৩৬৮, পৃ. ২১৮
পিতৃব্য বজলে করিমের অনুপ্রেরণায় ও অনুকরণে নজরুল ইসলাম এ–ধরনের কবিতা বা গান লিখেন। তিনি একটি লেটোদলের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর ও নজরুলের এ–জাতীয় গান লেটোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস।

১২ *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, ৯বর্ষ, ১ সংখ্যা শ্রাবণ –আশ্বিন, ১৪০০, পৃ. ৪২–৪৩

(১৩)

নী-আ-চুনা বে-তু এ্যায় বেহেস্তী
রোয় মশগুলাম
কে ইয়াদি দীদার জামী
মিয়ায়েদ খোল্‌তানাম্‌।
যে-দি-দাস্ত না তোয়ানাম্‌
দীদারে করদান্‌
গারে আজ মোকাবেলা
কে তার মিয়ায়েদ বীনাম।
নজরুল ইসলাম বোগোয়েদ
তু-সবর মী ফরমায়েদ
চুন্দরে চাশ্‌কে শাহেদ
ইয়াদ তু কুন হারদাম।।

* * *

প্রেমেতে মত্ত হেন মন
নিজেকে হয় না স্মরণ,
অপ্সরীর মতো কদম
মরি কি রূপ অনুপম

---

১৩. বিশ্বনাথ দে, 'কবির বাল্যরচনা', *শতকথায় নজরুল* (কল্যাণী কাজী সম্পাদিত), কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৪৯–৫০

'রুবাই' ফার্সি-কবিতার আঙ্গিক (form)। নজরুল এই আঙ্গিকে প্রথমে ফার্সিতে ও পরে বাংলায় গানটি রচনা করেন। বাংলা-ইংরেজি ভাষার মিশ্রণে রচিত গান তামাশা (Comic) পর্যায়ের, কিন্তু রুবাই প্রেমের গান। এতে বাংলা-ফার্সি শব্দের মিশ্রণ নেই। বিশ্বনাথ দে বলেন, "তাঁর ফারসী-বাংলা রুবাই গান ... বাংলা -ইংরেজী মেশানো কমিক গান প্রভৃতি সেই লেটোর দলে থাকাকালে রচিত হয়।" (ঐ, পৃ. ৪৭)। এরূপ মিশ্ররীতির গান লেটোগানে চালু হয়, বৈচিত্র্য আনার জন্য। রাতভর গানের আসরে দর্শক-শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখাই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তাঁরা উদারভাবে গ্রহণ করতেন।

মিটে না সাধ তোমায় হেরে।
জাগিয়ে হে প্রাণেশ্বরে
মরলেও তার বক্ষ পরে
        নাই গো দুঃখ প্রিয়তম।
নজরুল ইসলাম কয় খেদে
প্রিয়ার রূপ আঁখি মুদে
        সর্বদা কর স্মরণ।।
                —রুবাই গান

লেটোর পালা
শকুনি বধ

শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ।
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডাকাণ্ড হয়েছিল উন্মাদ ! !
অজা হয়ে কোন সাহসেতে
বাধ সাধিস মহাবলী বাঘের সাথে।
ভেক হয়ে ফণির সাথে বাধ, তুমি বাধ।।
শূকর মত্ত করীবরে,
যুদ্ধে কি কখনো পারে ?
খঞ্জে লম্ফে মহাবীরে এ কি পরমাদ !
নজরুল এসলাম বলে সাবাস !
ধোপার মুটের গাধা তাজীঘোড়া জিনিতে আশ।
সাবাস্ তোরে সাবাস্ ! ধিক তোরে উন্মাদ ! ![১]

---

১. *সাঁকো* (শারদীয় সংখ্যা), কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১৮, সুশীলকুমার গুপ্ত – *নজরুল চরিতমানস*, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ.৩৭
গানটি পশু-প্রাণীর রূপকের আশ্রয়ে রচিত। এটি কবির লড়াইয়ের অংশ- বিশেষ ; শকুনি বধের পুরো পালা সংগৃহীত হলে মূল বিষয়বস্তু জানা যাবে। প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উক্ত গানটি রচিত হয়েছে।

চাষার সঙ্‌

(১)

চাষ কর দেহ-জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে।।
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলো তুমি বিধি-মতে,
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।।
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত যাহার,
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।।
যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্‌ জাকাত লাগাও তুমি,
আরো সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে।।

---

১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনা-সম্ভার*, কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ৫২
গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ জ্যেষ্ঠ ১৩৫৪ 'দৈনিক আজাদে'। সুশীলকুমার গুপ্ত 'নজরুল-চরিতমানস' (কলকাতা, ১৩৮৪) গ্রন্থে গানটির উল্লেখ করেন ; তিনি দৈনিক আজাদের বরাত (reference) দেন। কল্যাণী কাজী সম্পাদিত 'শতকথায় নজরুল' (কলকাতা, ১৪০৫) গ্রন্থে বিশ্বনাথ দে রচিত 'কবির বাল্যরচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে গানটি সংকলিত হয়েছে। এতে তৃতীয় স্তবকটির পাঠ কিছুটা ভিন্ন। তাঁর পাঠটি এরূপ :

নয়টি নালা আছে তাহার
ওজুর পানি নিয়াত ইহার
ফলে পানি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।। (ঐ, পৃ. ৫১)

স্মৃতিচ্যুতি অথবা সংগ্রহের ত্রুটির কারণে এরূপ পরিবর্তন হতে পারে।

(২)

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধি–মতে
রবে যদি সুখেতে
এই পৃথিবীর মাঝার।
জমি 'উগালে' 'সামালে'
বীজ ফেলাও কুতূহলে ;
পাবে তবে সেই ফসলে
মেহনতের সার।।
লাগাও ধান প্রধান ফসল
তরকারি কলাই সকল।
দাও সময়মত জল
যাতে প্রাণ বাঁচেন তার।
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে।
নজরুল ইসলাম বলে
নইলে বাঁচা হবে ভার।।[২]
— আবাদের গান

(৩)

আমরা যে ভাই বানর মারা
বানরের যম সবাই জানে।
বানর শিকার করে ফিরি

২ ঐ পৃ. ৫৩ ; বিশ্বনাথ দে সংগৃহীত গানে দ্বিতীয় স্তবকটি নেই। ১নং গানের প্রথম স্তবকের সাথে অংশত মিল থাকায় তিনি সম্ভবত এটি বর্জন করেন। *শতকথায় নজরুল*, পৃ. ৫২

৩. বিশ্বনাথ দে, ঐ, পৃ. ৫২–৯৩

আমরা যখন যাই যেখানে।।
বানরের উৎপাত যেখানে
আমরা সবাই যাই সেখানে,
তাক করি ধনুর্বাণে
দমন করি পাপীজনে।।
[বানর ধরার পর তাদের উদ্দেশ্যে]
রে দুর্মতিগণ
তোদের কেন ও দুর্ঘটন?
কত গাছে লম্ফঝম্ফ
কেন থির এখন?
বড় সবে উৎপাত করিতে
আলসী পেয়ে প্রাণ কাঁদাতে।
কোথায় সে ভীষণ রব
পড়ে আছ কেন নীরব
যেদিকে তাকাই কেবলি শব
ঠিক হয়েছে সে এখন।।
যেমন কর্ম তেমনি ফল
পেলি তোরা রে দুষ্ট খল।
(মনে করে দেখ সকল)
নজরুল ইসলাম ভেবে কয়
এই ত রে দুষ্টের দমন।
— বানর মারার দলীয় গান।।

রাজপুত্রের সঙ

চল ওহে মন্ত্রীসুত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখিলাম দেশ-দেশান্তরে।।
অসংখ্য গ্রাম নগরাদি
দুর্গ গুহা পর্বতাদি
কত নদনদী দেখিলাম, নিরবধি স্বদেশ জাগিছে অন্তরে।।

রাজকুমার : মন্ত্রী-নন্দন! অনেক দিন হইল। স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছি - এখন মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' তাহা তো তুমি জানো। অতএব চল শীঘ্র নিজ দেশে ফিরিয়া যাই।

মন্ত্রী : রাজকুমার । এ দাস তো সদা-সর্বদাই উপস্থিত। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।

রাজপুত্র : তবে শীঘ্র উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হও।

মন্ত্রী : কুমার। অশ্ব এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমস্তই সজ্জিত হইয়াছে। আসুন আরোহণ করুন।

রাজপুত্র : তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? শীঘ্র চলো।

মন্ত্রী : কুমার যাচ্ছি যাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে দুটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি দুইটি ঘোরতর অপরাধ করিলেও তাহা মার্জনা করিবেন। তবেই যাই।

রাজপুত্র : মন্ত্রী-নন্দন। আমার কথায় কোনরূপ পার্থক্য হইবে না। নিশ্চয়ই তোমার কথামত কার্য করিব।

[গীত]

শুন শুন মন্ত্রী-নন্দন
কথার পার্থক্য হবে না যদি মোর যায় জীবন।।
যদি সূর্য পশ্চিম দিকে

উদয় হয়ে থাকে
কিংবা অন্যদিকে
তবু মন্ত্রী মমবাক্যে মিথ্যা নাই তো কদাচন।।
যদি অতি ঘোরতর
মোর কাছে অপরাধ কর
কিংবা প্রাণ হয় কাতর
নির্ভয় অন্তরে কর কার্য সম্পাদন।।
নজরুল এসলাম কয়
তোমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়
হইবে হে লয়
এখন তোরে দেয় অভয় পরে বিষ করিষণ।।

মন্ত্রী তবে আপনি অগ্রসর হউন। আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

রাজপুত্র : (কিছু দূর গিয়া) মন্ত্রী! সম্মুখে যে এক ভীষণ নালা! পার হইব কেমনে?

মন্ত্রী : কুমার, সাবধান! সম্মুখের নালা ডিঙাইবেন না। (এই বলিয়া ঘোড়ার পা কাটিয়া দিল)।

রাজপুত্র : কি মন্ত্রী। তুমি আমার তরবারীর ভয় রাখ না? তোমার এত স্পর্ধা যে বিনা কারণে আমার অশ্বপদ কাটিয়া দিলে?

মন্ত্রী : (জোড় হাত) কুমার, ক্ষমা করুন। আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন।

রাজপুত্র ও হে! আমি যে নিজের প্রতিজ্ঞায় নিজেই বদ্ধ। আচ্ছা চলো।

মন্ত্রী : (কতদূর গিয়া) ঐ যে আপনার সিংহদ্বার। আপনি এইখানে অবস্থান করুন।

রাজপুত্র যাও। শঘ্রি যাও। রাজ–বাটিতে গিয়া সংবাদ দাও।

মন্ত্রী : (কিছুক্ষণ পরে) কুমার আসুন। আপনার পিতা আপনার সম্মানের জন্য আসিতেছেন। আপনি আপনার পিতার সম্মানের জন্য পদব্রজে আসুন।

রাজপুত্র : আচ্ছা, চলো মন্ত্রী। (চলিতে চলিতে) একি ! আমার সিংহদ্বার কে ভাঙিল ?

মন্ত্রী : আমি ভাঙিয়াছি। আপনি যে দুইটি অপরাধ মার্জনা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল।

রাজপুত্র : কিন্তু মন্ত্রী। শীঘ্র ইহার কারণ বলো, নতুবা তোমার প্রাণ সংশয়।

[গীত]

প্রতীজ্ঞার কথা মন্ত্রী নাই স্মরণ আমার
শীঘ্র কারণ না বলিলে প্রাণ বাঁচা তোর হবে ভার।।
অমূল্য জীবন বাঁচাতে
যদি তব ইচ্ছা থাকে
মোর নিকটেতে
এর সত্য কারণ বলিতে হও তুমি আগুসার।
অশ্বপদ কাট কি কারণ
সিংহদ্বারের দশা কেন করিলে এখন
শীঘ্র কও সত্য বিবরণ
নইলে পাবে না হে নিস্তার।।
নজরুল এসলাম কয় কাতরে
এই বারে মন্ত্রী পড়েছে বিষম ফেরে
ঈশ্বর না করালে পার নাই তব উদ্ধার।।

রাজপুত্র : মন্ত্রী–নন্দন। চাতুরী ছাড়ো।

মন্ত্রী : কুমার। আপনার এই পদ্মপুষ্পের ন্যায় সৌম্য মূর্তি বিচলিত হইল কেন ? (চিন্তিয়া) হায় ! তবে কি আমার আজন্ম পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে ? হায়। আমি কি হতভাগ্য ! কুমার যদি একান্তই শুনিবেন তবে আসুন আপনাকে কানে কানে বলি।

(কানে কানে ফিসফিস কি বলিল) হায় ! একি, আমার অষ্টাঙ্গ কাঁপিতেছে কেন ? একি, অষ্টাঙ্গ পাষাণ হইয়া গেল !

[গীত]

বল ওস্তাদ ইহার কি উপায় হইবে
কি রূপেতে পাবে মুক্তি – কে ইহার প্রাণ বাঁচাবে ?
কিসে মন্ত্রী পাবে প্রাণদান
বল ওস্তাদ তাহার সন্ধান
কিম্বা সে হয়ে পাষাণ
জন্ম-জন্মান্তরে রবে ?
অশ্বপদ মন্ত্রী-নন্দন
কেন কেটেছিল তখন
সিংহদ্বার কিসের কারণ
ভেঙেছিল বলে যাবে।।
কি কথা সে রাজ-নন্দনে
বলেছিল কানে কানে
বলে পাষাণ হল কেনে
এর সত্য তত্ত্ব বলিবে।।
নজরুল এসলাম ভেবে বলে
বল ওস্তাদ সভাস্থলে
উত্তর দিতে না পারিলে
উপযুক্ত অপমান হবে।।[১]

---

১. সেলিম জাহাঙ্গীর, *লোকায়ত নজরুল*, ঢাকা,১৯৯৭, পৃ. ১০৮–১১০
গদ্য-পদ্যে রচিত এই পালাটি লেটোগানের কবির লড়াইয়ের অংশ-বিশেষ। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে এ লড়াই চলে: "বল ওস্তাদ সভাস্থলে/উত্তর দিতে না পারিলে/উপযুক্ত অপমান হবে।"—স্পষ্টত এটি একটি 'চাপান'। আসরে প্রতিপক্ষ এর উত্তর দিবেন। রাজপুত্র- মন্ত্রীপুত্রের সংলাপবদ্ধ ক্ষুদ্র ঘটনাটি রহস্যপূর্ণ ; এটি একটি রূপক - রাজপুত্রের জীবনের নিরাপত্তার জন্য মন্ত্রীপুত্র যে অশ্বপদ কেটেছে ও সিংহদ্বার ভেঙেছে, তাতে সন্দেহ নেই ; কারণ নদীপার ও সিংহদ্বার অতিক্রম কালে রাজপুত্রের জীবননাশের ফাঁদ পাতা ছিল বলে আমাদের অনুমান। রাজপুত্রকে কানে কানে উত্তর বলায় মন্ত্রীপুত্র পাষাণে পরিণত হয়। এটি শর্ত ভঙ্গের শাস্তি। লোককলায় এরূপ

আকবর বাদশার সঙ

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারীতা'লা।
তারপরে দরূদ পড়ি
মোহাম্মদ সাল্লেআলা।।
সকল পীর আর দরবেশ-কূলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে।
হয় যেন গো মুখ উজ্জালা।
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমরই ও গো খোদাতলা।। [১]

— বন্দনা গান

শর্তযুক্ত ট্যাবু (Tabu) আছে। পালাটির উৎস লোককাহিনি। এর প্রকৃত উত্তরটি কি - তা আমাদের জানা নেই।

১. *'নজরুল রচনা-সম্ভার,* পৃ. ৪৫

সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিতমানস' গ্রন্থে গানটির দ্বিতীয় স্তবকের পাঠে ভিন্নতা আছে।

সকল পীর আর দরবেশ-কূলে
সকল সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে,
হয় যেন গো মুখ উজ্জালা। (ঐ, পৃ. ৩৭)

শেখ আজিবুল হক 'আকবর বাদশার সঙ' পালাগানটি সংগ্রহ করে নজরুল একাডেমী পত্রিকায় (৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ,১৪০০) প্রকাশ করেন। পালাটি আমরা সংকলনে গ্রহণ করেছি। দেখা যায়, পালাটিতে এই বন্দনা গানটি নেই। আমরা মূল ও পাঠান্তর আকারে উভয় গান পরিবেশন করলাম।

বাদশার ডাকসুরা :

সাজ সাজ সাজ সেনাপতি
সাজো হে যত সৈন্যগণ
দুরন্ত পাঠান রাজ মম এ রাজ্য মাঝ
দৌরাত্ম্য করিছে অকারণ।।
গৌড়বঙ্গ অধীশ্বর সুলেমান কররানী
করেছিল সন্ধিস্থাপন
কিন্তু তাহার সন্তান দাউদ খাঁ হতজ্ঞান
মমরাজ্যে অধিকার করেছে এখন।।
ছি ছি ছি, ভারত অধীশ্বর আকবর
রাজ্য জয়ে তার মন।
দুর্বল মুশিক হয়ে সিংহ পরাজয়ে
বাসনা করেছে সে দুর্জন।

আকবর : কোথায় সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ?

হোসেন : বাদশা আলমপানা, গোলামকে কি জন্য আহবান করেছেন?

আকবর : হোসেন সেই বঙ্গ অধীশ্বর দাউদ খাঁ সন্ধিভঙ্গ করে আমার একটি দুর্গ অধিকার করেছে। পাপাত্মা যখন বিদ্রোহী হয় তখনি মুমেন খাঁ ও তুগুরমল্ল সেনাপতি তাকেও পরাজিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়। পরে আমার পদানুসরণ করে বসতি করে। এখন সেনাপতি মুমেন খাঁর মৃত্যু হয়েছে শুনে সে পুনরায় বিদ্রোহী হয়েছে। এ নির্লজ্জার প্রাণে ধিক! হোসেন, আমি চাই দাউদের মস্তক এবং রাজ্যের ধ্বংস।

[গীত]

ধিক ধিক ধিক শত ধিক তোর নিলর্জ্জার প্রাণে
বিদ্রোহী হয়েছে নির্বোধ কি ভেবে মনে।।
ভারতবর্ষের সম্রাট মহাবীর আকবরে
জানে নাই কি পাষণ্ড ভয় নাই অন্তরে।
কার জোরে মাতে সে সমরাঙ্গনে।।

কেকলাস হয়ে সে ভাবে মারব অজগরে
পক্ষিখরাজে করিতে জয় বায়েস ইচ্ছা করে।
তাই কি রে সম্ভব কভু মনে।।
ঘুঘু কি বাজপাখী জয় করিতে সমর্থ হয়?
নেকড়ে ছানা কি বাঘের সম্মুখীন হয়?
কভু মৃগ মৃগয়ে শার্দুল সনে?
সাজ হে সেনাপতি ধর অস্ত্র নিশ্চয়
পাষণ্ডের মুণ্ড আন **নজরুল ইসলাম** কয়।
হও নির্ভয় আজ পাঠান রাজ্য জিনে।।[১]

আকবর : হোসেন তবে শীঘ্র যাও। পাষণ্ডের মুণ্ড আন।

[হোসেনের প্রস্থান]

হোসেন : সৈন্যগণ শীঘ্র সমরসজ্জা করে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা কর।

সৈন্যগণ : সেনাপতি ! সেনাসজ্জা ইত্যাদি ঠিক হয়েছে। চলুন।

[গৎবাদ্য]

হোসেন : সৈন্যগণ স্থির হও, এই যে শত্রু-শিবিরে আর কেন? ঐ যে আমাদের সৈন্য দেখে তাদেরও সৈন্যগণ এদিকে আসছে। শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে গতিরোধ করো।

সৈন্যগণ : সেনাপতি ! এই তো ব্যূহ রচনা। এখন আপনি নিজের রণকৌশল দ্বারা শত্রুদের হৃদয়-কম্প উপস্থিত করুন।

হোসেন : আচ্ছা আমি আগায় যাই। (সজোরে) কোথায় রে নির্লজ্জ দাউদ। হয় আজ তোর পতন কিংবা আমার পতন। স্ত্রীলোকদের মত সৈন্যদের মাঝে কেন? তোতে আমাতেই যুদ্ধ শেষ করি। আয় পাষণ্ড শীঘ্র আয়।

---

১. 'শকুনি বধে'র সাথে এটি এ পরের গীতের ভাব ও ভাষাগত মিল আছে। গীতে নজরুলের নাম -ভনিতা আছে। দুই অসম শক্তির দ্বন্দ্বে এ-ধরনের উপমা প্রয়োগ করা হয়। এগুলো যুদ্ধে সমর-নায়কদের ভাষা।

[গীত]

আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই দেখব আজ তোরে
প্রত্যেক বার পরাজয়ে লাজ নাই অন্তরে।।
রানীদের মত কেন সৈন্যদের মাঝে
আছিস কেন রে কাপুরুষ বুজেছি কাজে।
আর কি রে চাতুরি সাজে মম সমরে।।
খেকশিয়ালীর মত হয়ে মাতঙ্গের সনে
হিংসা রাখো ছি ছি পাগল হাসি পায় মনে।
হিমালয় কি খঞ্জগণে লঙ্ঘিতে পারে।।,
কুকুর ছানায় বাদ সেধেছে হায়ানোর সাথে
চড়ুই পাখির দল এসেছে মার্জারে সান্ধিতে
(এরা) বুঝেছে সব ভুজঙ্গেতে মারব গরুড়ে।।
বৃষশৃঙ্গে বসলে মশা হয় কি অনুভব
নজরুল এসলাম বলে গিধড় হয় নারে মানত।
(তেমনি) মিছে নাড় হস্ত পদ বুঝি এই বারে।।

হোসেন : নির্লজ্জ! অসাধ্য সাধনে আশা–সলিলে আঁকিয়াছ রেখা। রবে না এ রেখা জানে সর্বজনে। হে উন্মাদ তবে কেন রটাবে কলঙ্ক। সুগন্ধ কি মৃগগণে করিয়াছে জয়? শীঘ্র আয় নাশিতে তোরে, করিয়াছি হস্ত প্রসারণ। অজ্ঞান তিমিরে তুই হয়ে সমাচ্ছন্ন বৃথা করেছিস গর্ব। নাশিতে ওই গর্ব দেখ এই প্রচণ্ড অসি তোর মুণ্ডিত মস্তকে বসিবে রে ভীম বলে। আয় বৃথা ছাড়ি বাক্য ব্যয়। আয় নির্বোধ আয়, ভোগ কর কর্ম প্রতিফল।

দাউদ : আশ্চর্য! আশ্চর্য! তব হেলা, কৃষ্ণ সর্পের গর্ভেরে যদি কেহ করক্ষেপ করে তবে তার জীবনের আশা মিছে রে! দুর্জন! সত্বর হও সম্মুখীন। কর মহারণ। করে তব রক্তপান মিটাব ক্রোধ অগ্নিসম।

হোসেন : পাষণ্ড, প্রত্যুষের শশধর মত বৃথা করিস গর্জন। কত সহস্র দাউদ দেখিয়াছি রে আমি। ভীত নই তোর বাক্যে ধরি তরবার দে যুদ্ধ আজ। আয় নেত্র তন্দ্রাজালে মদমত্ত করা হয় না আবদ্ধ কভু।

মহাবীর আকবরের সর্বপ্রধান আমি। জানিস কিরে দুর্মতি আমি সেনাপতি। নির্ভয় শরীর মম নির্ভয় অন্তর। আয় আয় শীঘ্র আয়। হও সম্মুখীন।

দাউদ : নিশ্চয় । নিশ্চয় । মল্ল যুদ্ধেতে আয়। সহে না সহে না প্রাণে বিলম্ব আর।

(উভয়ের মল্লযুদ্ধ ও গৎবাদ্য)

হোসেন : অহংকার পতনের আগে আগে যায়। দুর্বৃত্ত কোথায় তব বৃথা আস্ফালন। কর অহংকার, ধর তরবার। আজি তবে ভূমিতলে করেছ শয়ন।

দাউদ : (ক্রন্দন স্বরে) ভাই হে পদে ধরি। ক্ষমা কর, আর আমায় লাঞ্ছনা কর না ; ছেড়ে দাও আমি রাজ্য চাই না। সৈন্য সামন্ত চাই না। চাই একমাত্র জীবন। আমি দেশত্যাগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির জীবনযাপন করব। তাই হে পদে ধরি, ছেড়ে দাও।

হোসেন : কি পরিত্রাণ? আর রক্ষা নাই।

[গীত]

বদ্ধাব ছেড়ে দে আশা মম সদনে
চাপ পড়িলে বাপকে ডাকে জানে সর্বজনে।।
পড়ে যদি শিকার কভু শিকারীর হাতে
সে কি পারে এড়াতে?
ময়না আজ শিকারীর হাতে পড়েছে আজ কুক্ষণে।।
অগ্রেতে না চিনে নির্বোধ কত প্রকারে
বলেছে অহংকার করে।
এখন কেন রে চরণ ধরে ভিক্ষা চাস রে জীবনে।।
বৃথা করো ত্রাহি ত্রাহি নয় রে আর
মুণ্ডচ্ছেদ করব এবার।
লয়ে তোর স্ত্রী–পরিবার যাব রে নিজ স্থানে।।
পিপীলিকা যক্ষের হাতে কেমনে এড়াবি
অদ্য যমপুরী যাবি।

যথোচিত লাঞ্ছিত হবি, **নজরুল এসলাম** ভনে।।

হোসেন : নির্বোধ, সম্বর এবে সম্বর রোদন। এই প্রচণ্ড অসিতে মম করি তব বক্ষ বিদারণ? (বুকে করাঘাত করে)।

দাউদ উঃ জীবন যায়। সহে না সহে না প্রাণে আর। হায় হায়। (মৃত্যু)।

হোসেন দুরন্ত! কোথায় তব অহংকার আজ। নয়ন যুদ্ধে ভূমিশয্যায় সজ্জিত কেন? যেমন কর্ম তেমনি ফল! সৈন্যগণ। পাষণ্ডের মুণ্ডু শীঘ্র আন এবং ইহার সমস্ত সৈন্যদিগকে চতুর্দিকে ঘিরে মার।

সৈন্যগন এই তো শত্রুসৈন্য সকলেই পটল তুলেছে। তবে সকল সৈন্যদের মুণ্ডু লয়ে শীঘ্র প্রস্থান কর। (মস্তক ছেদন)।

[গীত]

দেখ মেলে নয়ন কর্মের অনুরূপ ফল তোর এখন
আজ কেন নিঃশব্দেতে ভূমিশয্যায় করে শয়ন।।
তুই রে ভারত রাজা হয়ে
এসেছিলি সম্রাট–জয়ে
তেমনি আজ জীবন বিহীন
হয়েছে দেহ মলিন।
রক্তে তোর দেহ মলিন করেছে বক্ষ বিদরণ।।
মস্তক কেটেছে সুখেতে
পড়ে তোর সেই ভূমিতে
রইতিস কুসুম শয়নে, কিন্তু আজ শিয়ালগণে
শবে তোর বেড়ায় টেনে আজ কেন রে নাই অন্বেষণ।।
খঞ্জরে খঞ্জরে কেন
নিঃশব্দ হয়েছে হেন
সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ
লেগেছে বিষম রঙ্গ
তোর ঐ রাজ্য প্রসঙ্গ রইল কই তোর বেহায়া দুর্জন।।
ভেবেছিল ভিক্ষুক সন্তান
হব আমি রুমের সুলতান

শুনে মনে হাসি পায়
গাধা কি জিনে ঘোড়ায় ?
ঘুটে-কুড়েনীর বেটায় রেশমী পোষাক পরে কখন।।
শয়ন করে ছিন্ন চটে
লক্ষ টাকার স্বপ্ন ঘটে
মেথররা মনে ভাবে
জজ সাহেব হত এবে
নজরুল ইসলাম ভাবে, কোথায় তোদের সে আস্ফালন।।[২]

জেলে ও জেলেনী*

প্রথম দৃশ্য

[জেলে ও জেলেনীর উভয়ের কোমরে খারুই বাঁধা, ঘাড়ে খেপলা জাল নিয়ে আসরে প্রবেশ ; সামনে জোকার বিল— জেলের নাচ ও জেলেনীর গান]

জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরবে তালপুকুরে,[১] জেলো রে।
জেলোর কোমরেতে খারুই বাঁধা, জেলো রে।

---

২ শেখ আজিবুল হক, 'নজরুল সাহিত্যের এক অনালোচিত অধ্যায়', *নজরুল একাডেমী* পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ৫০-৫৩
"ঘুটে- কুড়েনীর বেটায় রেশমী পোষাক পরে।" প্রবাদটি সংকলনের ৩নং গানেও আছে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।" প্রবাদটিও কিছু ভাষান্তরে ব্যবহৃত হয়েছে। নজরুলের রচনায় প্রবাদের প্রচুর ব্যবহার আছে। সম্ভবত তিনি এখান থেকে তা রপ্ত করেন।

* মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, 'গ্রামীণ নাটক : লেটোগান', *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০২, পৃ. ২৯৩-৩০০
লেখক বলেন, পালাটি নজরুল ইসলাম বয়:সন্ধিকালে রচনা করেন বলে স্থানীয় প্রবীণ লেটোশিল্পীরা তাঁকে জানান। (ঐ, পৃ. ২৯৩) পালা শেষে 'দুখু মিয়া' ভনিতাও আছে। কিন্তু সরল ভাষা ও কবিত্বহীন প্রকাশভঙ্গি দেখে আমাদের মনে হয় না, এটি নজরুলের রচনা। হতে পারে অন্যের রচনা নজরুলের নামে চলোনো হয়েছে।

১ শিশুদের জন্য রচিত 'লিচু চোর' কবিতায় 'তালপুকরে'র কথা আছে।
বাবুদের তালপুকুরে সে কি বাস করলে তাড়া,
হাবুদের ডাল কুকুরে বলি থাম একটু দাঁড়া।– ঝিঙেফুল

জেলোর মাথাতে ফেটা বাঁধা, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরবে জোকার বিলে, জেলো রে।
জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে ।[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ : সামনে ডোমনী ডোবা]

দ্বৈত কণ্ঠে : ডোমনী ডোবায় এলো জেলে জাল ফেলাতে।
ডোমনী ডোবায় এলো জেলেনী, জেলোর সাথে।
[জেলোর জাল ফেলা]

দ্বৈতকণ্ঠে : ফেল জাল, তোল জাল
ঝপাং ঝপাং।

জেলো : আমার জালে মাছ উঠেছে
কোলা কোলা ব্যাঙ।।

[জেলেনীর জাল ফেলা]

দ্বৈতকণ্ঠে : ফেল জাল, তোল জাল
ঝপাং ঝপাং।
আমার জালে মাছ উঠেছে
কৈ, মাগুর, চেং।।
[নেচে নেচে]

দ্বৈতকণ্ঠে : ডোমনী ডোবায় মাছ নাই
আমপুকুরে যাবো।
আমপুকুরে না পেলে
তালপুকুরে যাবো।। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[হারুই ভর্তি মাছসহ জেলে-জেলেনীর প্রবেশ]

জেলেনী : জেলো আমার মাছ ধরেছে, রুই কাতলা, জেলো রে।
জেলো : জেলেনী মোর পয়মন্ত, জেলেনী রে।
জেলেনী : জেলো আমার মাছ ধরেছে চিংড়ি পুঁটি জেলো রে

জেলো মাছ ধরেছে কৈ মাগুর জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে চেং ছিমুড়ি,, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে খয়রা পোনা, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে রাই খয়রা, জেলো রে।
আমি মাছ বেচবো পাড়ায় পাড়ায়, জেলো রে।
আমি মাছ বেচবো বাড়ি বাড়ি, জেলো রে।
আমার মাছ নিবে বৌ-ঝিরা, জেলো রে।
আমি মাছ বেচে চাল কিনবো, জেলো রে। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[জেলেনীর সজ্জা ও চুপড়ি মাথায় মাছ বেচতে গমন]

জেলো : (নেচে নেচে) জেলেনীর মাথাতে চম্পার ফুল লো জেলেনী।।
ধুয়া
জেলেনীর কপালে কাঁচা পোকার টিপ লো জেলেনী।
জেলেনীর পড়নে শাখিপেড়ে তাঁতের শাড়ি লো জেলেনী।
জেলেনীর গায়েতে ছিটের শেমিজ লো জেলেনী।
জেলেনীর সিঁথিতে সিঁদুর লো জেলেনী।
জেলেনীর দুই হাতে দুই সাদা শাখা লো জেলেনী।
জেলেনীর মাথাতে মাছের চুপরি লো জেলেনী।। [১] [প্রস্থান]
[জেলেনীর প্রবেশ পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি রত]

জেলেনী : তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়ার গেরস্থরা।
আমার জেলো মাচ ধরেছে টাটকা খয়রা।।
তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়ার বৌ-ঝিরা।
আমার জেলো মাছ ধরেছে রাই খয়রা।।
তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়ায় মা বোনেরা।
আমার জেলো মাছ ধরেছে রুই আর কাতলা।।

---

১ . এই গীতের ভাব ও সুরে ঝুমুর গানের প্রভাব আছে।

তোরা কেউ মাছ্ লিবি গো পাড়ার মা মাসীরা।

আমার জেলো মাছ্ ধরেছে মাগুর চিংড়া।। [২] [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[দেশে আকাল –নদী, বিল, পুকুরে জল নেই। জেলে যাবে সাগরে মাছ্ ধরতে। তার যুবতী বৌ জেলেনী তাকে সাগরে যেতে দিচ্ছে না।]

জেলো : ও লো জেলেনী, আমার ভাত নাইরে ঘরে।
কি খাবা গো, যাবো যে মরে.।
আমি যাবো সাগরে।।
সেথা মাছ্ ধরবো রে,
মাছ্ বিচে টাকা আনবো রে,
তোর লেগে শাড়ি আনবো রে,
গয়না আনবো রে।।

জেলেনী : আমি যাবো তোর সাথে রে,
একলা ঘরে কেমন করে থাকবো রে
ও জেলো রে।।

জেলো : ও লো জেলেনী, তু একলা থাক ঘরে,
তব গাঁয়ে থাকবি রে,
বাড়ির পাশে রাঙা বুড়ির বাড়ি রে,
সে তুকে দেখবে রে।।
আমি মাছ্ ধরতে যাবো সাগরে।।

জেলেনী: ও জেলো তুই যাস্ না সাগরে।
তোর বিহিনে আমি থাকবো কেমুন কোরে রে,
ও জেলো তুই যাস্ না সাগরে।।

জেলো : ও জেলেনী, তুই থাকরে একলা
তুই থাকরে ঘরে।
আমি ঠিক ফিরে আসবো রে।

---

২ . এই গীতের আঙ্গিকে মেয়েলী গীতের প্রভাব আছে।

আকাল লেগেছে হায় খাবার নাই ঘরে।
তুই গোবর কুড়ুবি রে, ঘটি দিবি রে
তা বেচবি রে,
ছাঁকি জালে চিংড়ি পুটি ধরবি রে,
রাঙা বুড়িকে নিয়ে ঘরে রইবি রে
আমি আবার ফিরে, আসবো রে।
আমি একা যাবো রে
তোর যৈবুন দেখে যদি কেউ আমায় মেরে দেয় রে
তখুন কি হবে রে ;
তুকে নিয়ে পালিয়ে যাবে রে
তাই বলি তু ঘরে থাক রে।।

জেলেনী : ও জেলে তু যারে সাগরে,
আমি একলা থাকবো রে,
রাঙা বুড়ি লোক ভালো রে।
তুর যৈবুন আমি আগলে রাখবো রে,
ও তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস রে।।

পঞ্চম দৃশ্য

[জেলের জাল দড়ি নিয়ে সাগরে গমনের পর ১২ মাস পার হয়ে গেছে। জেলের কোন খবর নেই। কেউ তার খবর দেয় না ; কি তার হয়েছে। জেলেনীর বিলাপ। আসরে ঘুরে ঘুরে জেলেনীর গান]

জেলেনী : ও জেলো তুই গেলি সাগরে
আমি একলা থাকি ঘরে রে।
আমার মনে সুখ নাইরে,
ও তুই ঘরে ফিরে আয়রে

ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।
ও জেলো তুই বোশেখ মাসে গেলি রে
জালদড়া খারুই লয়ে রে।

গাবের কস্ করে জাল চুবালাম রে
আখার পাশে বসে বসে রে,
ও তু কবে আসবি ঘরে রে
সোনার যৈবুন আমার বৃথা যায় রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

জ্যোষ্ঠি মাসে রে গাছে গাছে পাকা আম রে,
ও জেলো, তু নাই মোর ঘরে রে,
মিঠা আম কেবা আনে রে।
আমি রোদে ধুপে গোবর কুড়ুই রে,
ঘসি দিই রে,
রাখাল ছোঁড়ারা আমার যৈবনু পানে তাকাই রে,
আমি মনের দুখে চোখের জল ফেলি রে
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

আষাঢ় মাসে রে মাঝ রেতে রে
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ আকাশ ঝরে রে।
পাউসেতে মাছ্ উঠে রে,
মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে রে
রাখালে বাগানে কত মাছ্ ধরে রে।।
আমি যে যৈবুন নারী, রেতে একলা যেতে নারি রে।।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

শাউন মাসে রে মাঠে মাঠে রে,
জল থে থে করে রে।
মাঝে মাঝে কড়্কড়্ মেঘ ডাকে রে
বেশাল জালে ছাঁকি দিতাম রে।
তু নাই কাছে, বেশালের এক ধার কেবা ধরবে রে।

আমি যে যৈবুন নারী, কারবা সাথে বেশাল ধরবো রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

ভাদর মাসে রে, জলে কাদায় রে,
যুবুতীরা সবার উপর শোস্ পাতে রে,
ভাঁজোর ছড়া গেয়ে গেয়ে গোল হয়ে নাচে রে।
তালের বড়া পিটে করে রে, ভাতার পুতকে খাওয়ায় রে,
আমার ভাতার নাই কো ঘরে, আমার কোলে পুত নাই রে।
কার বা লেগে তালে পিটে বড়া করি রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।

আশিন মাসে রে, আহ্য মাসের পুজো রে,
কত কত যুবুতী নারী রে,
তারা ভালো ভালো রঙিন শাড়ি পরে রে,
আমার জেলো নাই কো ঘরে রে,
কেবা শাড়ি কিনে দেয় রে,
আমি তেনা পিন্দে কাঁদি রে,
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

কার্তিক মাসে রে ধানের শীষে ফুল রে,
আলা দেখে পোকা মাকড় ঘরে আসে রে।
ছিঁড়া মশারিতে রে, পিনপিন করে মশা সিন্ধায় রে,
মশার কামড়ে জ্বলে মরি রে।
আমার জেলো আছে সাগরে,
কেবা শাড়ি কিনে দেয় রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

আগুন মাসে রে, চাষীরা সব লবান করে রে,
লগু চাল ভিজিয়ে গুড় কলা নারকেল মাখায় রে,
ঘরে ঘরে লতুন চালের ভাত রে,
আমার ঘরে নতুন চাল নাই রে,
দুখে আমার নয়ন ঝরে রে।
মাড়ে ভাতে খাই আমি রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

পউষ মাসে রে, জাড়ে হাত–পা ঠিটুরে যায় রে।
আমার গায়ে ছিঁড়া জামা রে,
পরনে ছিঁড়া তেনা রে,
ঘরে ঘরে চিতুই পিটে করে রে।
আমি জাড়ে মরি রে,
চিতুই পিটের আটা নাইকো রে।
আমার জেলো যে নাই ঘরে রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

মাগ মাসে রে, মাটের পুকুরে কত বেশাল জাল নামে রে
জোড়ে জোড়ে জেলো জেলেনীরা বেশাল টানে রে,
চিংড়ি পুঁটি গাগর বোয়াল ছিট্‌কি ধরেরে ;
আমার মনের মানুষ নাই কো ঘরে রে —
কার বা সাথে বেশাল টানি রে।
আমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদি রে।।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

ফাগুন মাসে রে, দখিন বাতাস বয় রে।
ভাতারের যুবুতীরা হাসি আমোদ করে রে,
আমি একলা থাকি ঘরে রে।

সোনার যৈবুন আমার বৃথা যায় রে,
চেংড়া ছোঁড়া আপাং এসে চোখ মারে রে ,
আমি দা কাটারি লাল চোখ দেখায় রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

চৈত্রি মাসে রে, পাড়ার জেলেরা পুকুর জমা লয় রে।।
জেলেনীর চুপড়ি কাঁখে পাড়ায় পাড়ায় মাছ লয়ে যায় রে,
আমি থাকি একলা একলা রে,
বোলানের দল পাড়ায় পাড়ায় গান করে রে,
পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ দেখি রে।
আমার জেলো নাইকো ঘরে রে, আমি মনের দুখে থাকি রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।।

ও আমার জেলো রে, সোনার জেলো রে –
দিন গেল মাস গেল বছর ঘুরে এলো রে,
তোর যৈবুন লয়ে আমি দুয়োরে বসে কাঁদি রে,
ও তু বাড়ি ফিরে আয় রে ;
দুখের সাগরে ভাসি রে, হাত ধরে কেবা তোলে রে।
ও আমার সোনার জেলো, তু বাড়ি ফিরে আয় রে।
দুখু মিয়া এ আসরে জেলেনীর দুখ গায় রে।।[১]

---

১. 'বারমাসী'র আঙ্গিকে রচিত এই গীতে জেলে সম্প্রদায়ের সংসার জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। বারমাসীতে সাধারণত গৃহস্থ ঘরের দুঃখের ছবি বর্ণিত হয়। প্রচলিত আঙ্গিকের অনুকরণ ও ভাষার সরলতা থেকে এটি দুখু মিয়ার প্রথম দিকের রচনা বলে প্রতীত হয়।